দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ঃ ... ...
পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ...৩......

একটি চিঠি ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক রাজনীতি প্রসঙ্গে কিছু কথা

ডঃ তারেক শামসুর রেহমান

একটি চিঠি জাতীয় সংবাদপত্রের চিঠিপত্র কলামে ছাপা হয়েছে গত ১৩ আগষ্ট। চিঠিটি পাঠানো হয়েছে জামাল খান সড়ক, চট্টগ্রাম থেকে। লেখকের নাম আছে। কিন্তু তার কোন পরিচয় দেয়া হয়নি। এ ধরনের চিঠি প্রতিনিয়তই সংবাদপত্রে ছাপা হচ্ছে। আর খুব কম ক্ষেত্রেই পত্র লেখকরা প্রতিকার পান। যে চিঠিটির কথা উল্লেখ করলাম, সেখানে পত্র লেখক নিজের কোন সমস্যার কথা তুলে ধরেননি। ধরেছেন জাতীয় একটি সমস্যার কথা। পত্র লেখক দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিকভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত উপাচার্যদের অপসারণ দাবী করেছেন। পত্র লেখকের যুক্তি যেহেতু তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশাসনে রাজনৈতিকভাবে নিয়োগপ্রাপ্তদের বদলি করার ওয়াদা করেছেন, সেহেতু রাজনৈতিকভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ভিসিদের অপসারণ জরুরী। পত্র লেখকের এই চিঠি যখন ছাপা হয়েছে, তখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দিকে যদি তাকানো যায়, তাহলে পত্র লেখকের বক্তব্যের সাথে অনেকেই একমত হবেন। বিগত সরকারের আমলে যাঁরা ভিসি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন, তাঁরা সবাই একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের অনুসারী। যে কারণে দেখা যায় তিনি ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই দলের স্বার্থ রক্ষা করেন। ফলশ্রুতিতে বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলো ক্যাম্পাস থেকে বহিষ্কৃত হয়। আর শিক্ষক নিয়োগে গুরুত্ব দেয়া হয় ঐ দলের অনুসারীদের। বাস্তবগত কারণেই দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করে রাজনৈতিক দলগুলো। বিশেষ করে ক্ষমতাসীন দলের প্রভাব সেখানে বেশী। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সেখানে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিতে অংশগ্রহণ করেন। বলা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ন্ত্রণ রক্ষায় সরকার আইনের আশ্রয় না নিয়ে এসব দলীয় শিক্ষকদের সহায়তা পায়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে একজন করে চ্যান্সেলর আছেন বটে। কিন্তু চ্যান্সেলর স্বাধীনভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, প্রো-ভিসি বা কোষাধ্যক্ষকে নিয়োগ করতে পারেন না। এখানে দলীয় চাপ থাকে এবং দলীয় লোকদেরই এ ধরনের পদে নিয়োগ দেয়া হয়। আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা ইদানীং উচ্চারিত হচ্ছে বিভিন্ন সেমিনারে। বলা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন শিক্ষক নিয়োগ করা হয় না– হয় ভোটার নিয়োগ। এবং নিজের স্বার্থেই তিনি তখন দলের কাজ করতে বাধ্য থাকেন।

যে কোন বিবেচনায় এ কথাগুলো গুরুত্বপূর্ণ। এক সময় ছিল যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারটি ছিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতা-পূর্বকালীন সময়ে এদেশের বুদ্ধিজীবীরা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্বায়ত্তশাসনের জন্য আন্দোলন করেছেন। তাঁদের দাবি ছিল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে স্ব-শাসিতভাবে গড়ে উঠতে হবে, সেখানে সরকারের কোন কর্তৃত্ব থাকবে না। স্বায়ত্তশাসনের আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যাতে সরকারী কর্মচারী হিসেবে পরিগণিত না হন। এখনও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরিচালনায় অর্থের অন্যতম উৎস হচ্ছে সরকারী বরাদ্দ। সরকারী বরাদ্দ পাওয়া না গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। নতুন নতুন বিভাগ খোলা যায় না। ছাত্রাবাস নির্মিত হয় না। নির্মিত হয় না শিক্ষক তথা কর্মচারীদের জন্য আবাস ভবন। এই আর্থিক নির্ভরতার সুযোগ নেয় সরকার। তারা তাদের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে চায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর। যারা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ, '৭৩ প্রণয়ন করেছিলেন, তাঁরা চেয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বশাসিতভাবে গড়ে উঠুক। গত ২৭ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আর্থিকভাবে স্বশাসিতভাবে গড়ে ওঠেনি। আর্থিক নির্ভরতা এখনও রয়ে গেছে। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে দেশে যখন বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ, '৭৩ জারি করা হল এবং বেশ ক'টি বিশ্ববিদ্যালয় যখন এর আওতাধীনে আনা হল, তখন ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছিল সেই উদ্যোগ। যাঁরা সেদিন এর প্রশংসা করেছিলেন, আজ তাঁরাই প্রশ্ন তুলেছেন এই অধ্যাদেশের ব্যবহার নিয়ে। এর পেছনে যে কোন যুক্তি নেই, তা নয়। যুক্তি আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকটি তখন আর উপাচার্য হতে পারেন না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষক রয়েছেন, যাঁরা কোনদিনই উপাচার্য হতে পারেননি এবং আগামীতেও হতে পারবেন না। সাধারণ মানের শিক্ষকরা আজ উপাচার্য হন। এ দেশে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রয়েছেন, যাঁদের আদৌ কোন পিএইচডি ডিগ্রী নেই। নামের আগে এঁরা 'অধ্যাপক' লাগান বটে, কিন্তু কোন উল্লেখযোগ্যসংখ্যক গবেষণাগ্রন্থও তাঁদের নেই। তাঁরা উপাচার্য হয়েছেন তাঁদের একাডেমিক যোগ্যতাবলে নয়, বরং তাঁরা উপাচার্য পদে নিয়োগ পেয়েছেন ক্ষমতাসীন সরকারী দলের সাথে সম্পৃক্ত থাকার কারণে। উপাচার্য হবার আগে এঁরা কেউ কেউ বড় দলের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যও ছিলেন। দল তাঁকে চেয়েছে অথবা তিনি দলকে ব্যবহার করেছেন উপাচার্য হবার জন্য। আজকাল পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়ে উন্নীত হয়েছে যে, উপাচার্য হবার যাঁদের খায়েশ তাঁরা আগেভাগেই বড় দলগুলোর সাথে, দলের উর্ধ্বতন নেতাদের সাথে সম্পর্ক রাখছেন। দলের অফিসে নিয়মিত যাচ্ছেন সাধারণ কর্মীদের মত। দলীয় সভায়তো বটেই, দলের বিভিন্ন ফোরামে তাঁকে বক্তৃতা দিতে হয়। দলও তাঁকে ব্যবহার করে তাদের স্বার্থে। এমন ঘটনাও ঘটেছে যেখানে সরকারী দলের ছাত্রনেতারা সম্ভাব্য ভিসি প্রার্থীদের মন্ত্রীপাড়ায় নিয়ে গেছেন, মন্ত্রীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। ঐসব শিক্ষক, যাঁরা ছাত্র নেতাদের কিংবা রাজনৈতিক নেতৃত্বের সমর্থন দিয়ে ভিসি হয়েছেন, তাঁরা কি করে ঐসব ছাত্রনেতাকে অস্বীকার করবেন? ছাত্রনেতাদেরকে ভিসি সাহেবরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে খুশী করেন। তাদের সিন্ডিকেটের সদস্য বানানো হয়। অর্থ কমিটিতে থাকেন কেউ কেউ। এভাবেই একজন সাবেক ছাত্রনেতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় পালন করেন গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা। বড় দু'টি রাজনৈতিক দলের সমর্থন ছাড়া এখন ভিসি হওয়া চিন্তাও করা যায় না। ভিসি হতে হলে তাঁকে একটি রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পর্ক রাখতে হবে। দেখা গেছে, যিনি কোনদিন আওয়ামী লীগ করেননি, তিনি ভিসি বা প্রো-ভিসি হওয়ার জন্য আওয়ামী লীগ করছেন কিংবা অতীতে বিএনপি'র শাসনামলে শিক্ষকদের অনেকে বিএনপি'র রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত হয়েছিলেন, আর কোনদিন বিএনপি করেননি। এমনও দেখা গেছে, শিক্ষকদের কেউ কেউ বিএনপি'র শাসনামলে জিয়া পরিষদের মত সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন, তাঁরাই আবার সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে আওয়ামী লীগ রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত হয়েছেন।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে দেশে যখন বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ, '৭৩ জারি করা হল এবং বেশ ক'টি বিশ্ববিদ্যালয় যখন এর আওতাধীনে আনা হল, তখন ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছিল সেই উদ্যোগ। যাঁরা সেদিন এর প্রশংসা করেছিলেন, আজ তাঁরাই প্রশ্ন তুলেছেন এই অধ্যাদেশের ব্যবহার নিয়ে। এর পেছনে যে কোন যুক্তি নেই, তা নয়। যুক্তি আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকটি তখন আর উপাচার্য হতে পারেন না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষক রয়েছেন, যাঁরা কোনদিনই উপাচার্য হতে পারেননি এবং আগামীতেও হতে পারবেন না। সাধারণ মানের শিক্ষকরা আজ উপাচার্য হন। এ দেশে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রয়েছেন, যাঁদের আদৌ কোন পিএইচডি ডিগ্রী নেই। নামের আগে এঁরা 'অধ্যাপক' লাগান বটে, কিন্তু কোন উল্লেখযোগ্যসংখ্যক গবেষণাগ্রন্থও তাঁদের নেই। তাঁরা উপাচার্য হয়েছেন তাঁদের একাডেমিক যোগ্যতাবলে নয়, বরং তাঁরা উপাচার্য পদে নিয়োগ পেয়েছেন ক্ষমতাসীন সরকারী দলের সাথে সম্পৃক্ত থাকার কারণে।

শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে বিগত সরকারের সময় যেসব কথা বলা হয়েছে, তার মাঝে কোন অসত্য নেই। এ নিয়ে পত্র-পত্রিকায় একাধিকবার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। কাউকে কাউকে আইনের আশ্রয়ও নিতে হচ্ছে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় যেখানে 'ষ্টার'-এর ছড়াছড়ি, সেখানে চারটি দ্বিতীয় বিভাগ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়েছেন– এসব ঘটনাও ঘটেছে কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে। পদোন্নতির ক্ষেত্রে অনিয়ম ঘটে চলেছে একের পর এক। যিনি যোগ্য, তাঁকে বিবেচনায় আনা হয়নি। অথচ যিনি অযোগ্য তাকে বিবেচনায় আনা হয়েছে ও পদোন্নতি দেয়া হয়েছে– এ ঘটনাও বিরল নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক তরুণ শিক্ষকের কথা জানি, যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতার পদে যোগ দিয়েও সরকারী ছাত্র সংগঠনের সাথে তাঁর সম্পর্ক রক্ষা করে আসছিলেন। শিক্ষক হয়েও ছাত্রনেতা হিসেবে বক্তৃতা দিয়েছিলেন মফস্বলের একটি কলেজে। আর সে সংবাদ ছাপাও হয়েছিল পত্রিকায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতার পদে এখন আর শিক্ষক নিয়োগ করা হয় না, নিয়োগ করা হয় ভোটার। যোগ্যতা এখানে চারটি প্রথম শ্রেণী নয় কিংবা একটি পিএইচডি ডিগ্রীও নয়, বরং দলের সাথে তিনি বা তাঁরা কতটুকু সম্পৃক্ত কিংবা দলের উর্ধ্বতন নেতারা তাঁর জন্য ভিসি বা প্রো-ভিসিকে ফোন করেন কিনা, সেটাই হল বড় যোগ্যতা। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এখন আর মেধার সম্মান দেয়া হয় না। অযোগ্যরা আজ যোগ্য পদগুলো দখল করে নিচ্ছে। এটা দুঃখজনক। উচ্চশিক্ষার জন্য এটা কখনও মঙ্গলজনক নয়।

তাহলে কি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন হবে না? রাজনৈতিক দলগুলো কি এভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করবে? অযোগ্য ব্যক্তিরা কি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতার পদগুলো বাগিয়ে নেবে? এসব প্রশ্ন এখন জোরেশোরেই উচ্চারিত হচ্ছে। বলা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ '৭৩-এর কিছু কিছু ধারা পরিবর্তন করা প্রয়োজন। এই অধ্যাদেশবলে শিক্ষকদের অবাধ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। এই স্বাধীনতার অপব্যবহার হচ্ছে। বলতে বাধা নেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজনীতি এখন আবর্তিত হচ্ছে ভিসি পদকে ঘিরে। শিক্ষক রাজনীতির কারণেই দলী[য়] বিবেচনায় 'ভোটার' বানানো হচ্ছে। তারপর ভোটারদের দিয়ে সিনেট গঠন করা হচ্ছে, যে সিনেট তিন সদস্যবিশি[ষ্ট] ভিসি প্যানেল নির্বাচন করছে। যেখান থেকে চ্যান্সেলর একজনকে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেন। প্রো-ভিসিকে কিংবা ট্রেজারার পদে নিয়োগ দেয়ার অধিকার রাখেন চ্যান্সেলর। কিন্তু তাঁকে মনোনীত করার অধিকার তাঁর নেই উপাচার্যের সাথে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরাই এই পদগুলোতে মনোনীত হন এবং চ্যান্সেলর তাঁদের নিয়োগ দিতে বাধ্য হন এক্ষেত্রে প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতার চেয়ে দলীয় আনুগত্যই প্রাধান্য পায় বেশি। বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ '৭৩-এ[র] সংশোধন কিংবা পরিবর্তন তাই জরুরী। তবে এটা কিভাবে সম্ভব, তা স্পষ্ট করে বলা কঠিন। এ-ব্যাপা[রে] বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক সমিতিগুলোর মতামত চাওয়া যেতে পারে। এখানে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ঢাক[া] কিংবা জাহাঙ্গীরনগরের মত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অনুযায়ী পরিচালিত হলেও, প্রকৌশ[ল] বিশ্ববিদ্যালয়ের মত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এই অধ্যাদেশের বাইরে রাখা হয়েছে। এ কারণেই দেখা যায় ঢাকা জাহাঙ্গীরনগর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যতটুকু শিক্ষক রাজনীতি হয়, তার সিকিভাগও হয় না প্রকৌশ[ল] বিশ্ববিদ্যালয়ে। বুয়েটে কোন সিনেট নেই। সিনেট সেখানে ভিসি প্যানেল নির্বাচিত করে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের যি[নি] সিনিয়র শিক্ষক, তিনি ভিসি হন। ঠিক তেমনিভাবে অনুষদের যিনি সিনিয়র শিক্ষক তিনি ডীন হিসেবে নিয়োগপ্রা[প্ত] হন। এখানে কোন 'রাজনীতি' নেই। শিক্ষকরা আর কোন বড় দলের অফিসে যাতায়াত করেন না ভিসি পদে নিয়ো[গ] পাবার জন্য। সিনেট নির্বাচনের জন্যও আর শিক্ষকদের অযথা সময় নষ্ট করতে হয় না। বুয়েটের শিক্ষকরা যে ... ব্যাপারে অখুশী তাও নয়। এ ব্যবস্থা তাঁরা মেনে নিয়েছেন। তথাকথিত গণতন্ত্রের নামে তাঁরা আর সিনেট নির্বাচ[ন] দাবী করেননি। দেখা গেছে বুয়েটে শিক্ষক নিয়ো[গে] 'বিতর্ক' কম হয়। কেননা এখানে 'ভোটার' নিয়োগ ক[রা] হয় না। বুয়েটের এই ব্যবস্থাকে মাথায় রে[খে] বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ '৭৩-এর কিছু ধারায় পরিবর্ত[ন] আনা যেতে পারে। তবে এখানে ভয়েরও কিছু কার[ণ] রয়েছে। বুয়েটে ভিসি নিয়োগের একক কর্ত[ৃত্ব] চ্যান্সেলরের। এক্ষেত্রে নিয়োগের ব্যাপারে রাজনৈতি[ক] বিবেচনা যাতে প্রাধান্য না পায়, সে ব্যাপারটি নিশ্চি[ত] করা জরুরী। মোটকথা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ পরিবর্ত[ন] বা সংশোধন করা জরুরী। কিন্তু এই পরিবর্তনের না[মে] সেখানে যেন কোন রাজনৈতিক কর্তৃত্ব না থাকে। ১৯৭[৩] সালের পরিস্থিতি আর আজকের পরিস্থিতি এক নয়। বি[...] প্রেক্ষাপটে এই বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশকে দেখাতে হবে[...] সরকার শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাবিদদের নিয়ে অথবা সাবে[ক] ভিসিদের নিয়ে একটি কমিশন গঠন করতে পারেন, যাঁ[রা] এ ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ দিতে পারেন। তাঁ[দের] পরামর্শ অনুযায়ী সরকার বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ '৭৩[-এ] কিছু পরিবর্তন বা সংশোধন আনতে পারেন। আ[রো] একটা কথা বলা প্রয়োজন। দেখা যায় রাষ্ট্রপ্রধা[ন] সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলর হন। বি[...] সাম্প্রতিককালে দেখা গেছে সরকার প্রধান চ্যান্সেলর হচ্ছেন। সরকার প্রধান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তিনি চ্যান্সে[লর] হলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কিছু সুবিধা নিতে চাইবেন। এটা ভালো নয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যও তা কোন ম[ঙ্গল] ডেকে আনতে পারে না। পৃথিবীর কোন দেশেই রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধানকে চ্যান্সেলর করার বিধান নেই। দক্ষি[ণ] এশিয়ার দেশ শ্রীলংকাতেও এ ধরনের বিধান নেই। চ্যান্সেলর হিসেবে সেখানে একজন সাবেক শিক্ষাবিদ, এক[জন] বুদ্ধিজীবীকে নিয়োগ দেয়া হয়। তাঁর ক্ষমতা সীমিত। পদটি অলংকারিক। শুধু তাঁর প্রতি সম্মান দেখিয়ে তাঁকে ... পদটি দেয়া হয়। আমাদের দেশেও এ রকমটি হতে পারে। যদিও সমস্যা রয়ে গেছে। আমাদের দেশেও বুদ্ধিজীবী[রা] এখন রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত। এদের কেউ বিএনপির রাজনীতির সাথে জড়িত, কেউবা আবার আওয়ামী লী[গ] রাজনীতিকে সমর্থন করেন। সুতরাং এদের কেউ যদি সে অর্থে মনোনয়ন পান, তাহলে তাতে পরিস্থিতির কো[ন] উন্নতি হবে না। সুতরাং এসব বিষয় বিবেচনায় আনা প্রয়োজন।

বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ '৭৩-এর নামে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে, তাতে পরিবর্তন আনা জরু[রী]। বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ-এর মূল 'স্পিরিট' ভালো থাকলেও ব্যক্তিস্বার্থে, দলীয় স্বার্থে তা আজ ব্যবহৃত হচ্ছে, হ[চ্ছে] অপব্যবহার। এটা পরিবর্তন বা সংশোধন করা না গেলে আগামীতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরিচালনায় বড় ধরনের [বিপর্যয়] নামতে পারে। সুতরাং যত দ্রুত এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়া যায় ততই মঙ্গল। সেইসাথে রাজনৈতিকভাবে নিয়োগ[প্রাপ্ত] ভিসিদের যত দ্রুত তাঁদের পদ থেকে সরিয়ে দেয়া যায় ততই সবার জন্য ভালো। উচ্চশিক্ষার স্বার্থেই বিষয়টি এ[খন] জরুরী হয়ে পড়েছে।

[লেখকঃ রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক